তারিখ ... OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয় মানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবাধ চর্চাস্থল

শতফুল ফুটতে দাও

ড. মাহবুব উল্লাহ্

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে বেশ ক'দিন ধরে গণমাধ্যমে তর্ক-বিতর্ক চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যেতে পারে এমনটি ভাবা অত্যন্ত দুষ্কর। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কী হয়নি এই দুই সিদ্ধান্তের কোনোটিতেই আমি একমত পোষণ করতে চাই না। যারা ভর্তি পরীক্ষাটির দায়িত্বে ছিলেন তারা প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি বলে দাবি করেছেন এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। তাদের প্রধান যুক্তি হল, গত কয়েক বছরের পরীক্ষার ফলাফলে যে পরিসংখ্যানগত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে তার সঙ্গে এবারের ফলাফলের উল্লেখযোগ্য বা তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পার্থক্য নেই। কী পদ্ধতিতে এই পার্থক্য বা মিলের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষকে জ্ঞাত করেনি। অথচ ফাঁসের খবরটি গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। এমনও অভিযোগ করা হয়েছে, ফাঁস করা প্রশ্ন চার-পাঁচ লাখ টাকায় বেনাবেচা হয়েছে। দৈনিক সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত খবর পড়তে গিয়ে জানতে পারলাম জনৈক অভিভাবক প্রশ্ন জোগাড় করতে না পারার জন্য তার কন্যাকে ভর্ৎসনা করেছেন। একালের কিছু অভিভাবকের মধ্যে যে চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তাতে বিচলিত না হয়ে পারা যায় না। যেখানে অভিভাবকরা তাদের সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যদের সৎ পথে চলার উপদেশ দেবেন, সেখানে যদি তারা বিপরীতধর্মী আচরণ করেন তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। একটি জাতির জীবনে যখন অবক্ষয়ের ধারা সূচিত হয়, তখন থেকে দিনে দিনে এই ধারা প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে। এ কারণেই বোধকরি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষককে বলতে শুনি, বিশ্ববিদ্যালয় বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। সার্বিক পরিমণ্ডলে যা কিছু হচ্ছে, সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রভাবিত করতে বাধ্য। এ ধরনের যুক্তি অসততা, অসাধুতা ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় মাত্র। ছোটবেলায় শিক্ষকদের নিয়ে লেখা একটি কবিতা পাঠ করেছিলাম। কবিতাটির মাত্র দুটি ছত্র এখন মনে আছে। ছত্র দুটি হল, মোরা শিক্ষক/ধরণীর মোরা দীক্ষক। শিক্ষকরা শুধু পাঠদান করে তাদের দায়িত্ব শেষ করবেন না, তারা শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনেও আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। এটাই শিক্ষকদের কাছে কাম্য।

বুঝতে কষ্ট হয় না, এখন কেন ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একেকটি ইউনিটে এক লাখের কাছাকাছি কিংবা তারও বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনেও জড়িত হন অনেক কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারী। এদের মধ্যে সবাই সৎ চরিত্রের মানুষ হবেন এমনটি আশা করা যায় না। যদি কোনো স্তরে একটি স্পর্শকাতর কার্যক্রমের সঙ্গে কোনো অসৎ ব্যক্তি জড়িত হয়ে পড়েন, তাহলে প্রশ্নফাঁসের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। প্রশ্নফাঁসের পর যে পর্যায়টি আসে সেটি হল বাস্তব পরীক্ষা। সঠিক প্রশ্নোত্তর কী হবে সেটাও আজকাল প্রযুক্তিগত ডিভাইসের মাধ্যমে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে পরীক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি যেমন আমাদের অনেক কাজ সহজসাধ্য করে দিয়েছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে অনেক বিড়ম্বনাও। তাই বলে প্রযুক্তিকে পরিত্যাগ করতে হবে, এমনটি নয়। বরং বিড়ম্বনাকে কীভাবে পরিহার করা সম্ভব সেই দিকে মনোযোগী হতে হবে।

পরিসংখ্যানগত পর্যবেক্ষণে ধর্তব্য কোনো পার্থক্য না হওয়ার একটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। হয়তো প্রশ্নফাঁস হয়েছিল; কিন্তু তা সীমাবদ্ধ থেকেছে গুটিকতক সুযোগ-সন্ধানীর মধ্যে। পরিসংখ্যান ভুলের মাত্রা নিরূপণের বিজ্ঞান। পরিসংখ্যান বলে, ৯৫ শতাংশ আস্থার স্তরে ধর্তব্য নয় অথবা ৯৯ শতাংশ আস্থার স্তরে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এই যে ৫ শতাংশ কিংবা ১ শতাংশ ধর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে গেল, সেখানেই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে অপরাধীদের। এ কারণেই পরিসংখ্যানগত প্রক্রিয়ায় মনে হয়েছে বিগত বছরগুলোর পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এ বছরের পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যানিক বিচারে বিবেচ্য কোনো পার্থক্য ধরা পড়েনি। তবে হাজারের মধ্যে একজনও যদি প্রশ্ন পেয়ে থাকে, তাহলে সে অন্য একজন সৎ পরীক্ষার্থীকে বঞ্চিত করল। তার গুণগত মান হয়তো অনেক ধাপ নিচে। তদসত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সে পেয়ে যেতে পারে। মাত্রাগতভাবে এই অবিচার উল্লেখযোগ্য না হলেও ভয়াবহ অবিচার তো বটেই। যাই হোক, আমাদের মতো যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় ছাত্র কিংবা ছাত্রী ছিলাম, কিংবা এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছি, আমাদের শুধু একটি শুভ কামনা থাকবে, সেটি হল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব যেন ম্লান হয়ে না যায়।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। ড. সুফিয়া আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস নিয়ে একটি দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের শিক্ষক ভবতোষ দত্তের (যিনি নিজেও একজন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ) আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ '৮ দশক'-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে। এই বইটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখযোগ্য। তৎকালে উচ্চশিক্ষার বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল সে সম্পর্কে এই বই পড়ে সম্যক ধারণা করা যায়। শুনেছি সৈয়দ আবুল মকসুদও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন। এই বইটি পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। ধারণা করি বইটি পড়লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছু জানা যাবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরও অনেক বেশি গবেষণা হওয়া উচিত ছিল। এসব গবেষণার মাধ্যমে আমরা জানতে পারতাম প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতটা এগিয়েছে কিংবা পিছিয়ে পড়েছে।

ভারতের জওহর লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রোশিওরে নেহেরুর একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি বছরের পর বছর ছাপা হতে দেখেছি। এখন ভারতে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন। দলটি তাদের আদর্শিক মিত্রদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের দায়িত্ব দিয়েছে। এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রোশিওরের কভার পেজে নেহেরুর উক্তিটি বহাল রয়েছে কিনা বলতে পারব না। পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্যের একটি তাজমহলকেও গুঁড়িয়ে দেয়ার কথা উঠেছে ভারতে। সুতরাং সব কিছুই সম্ভব। নেহেরু বলেছেন, A University Stands for Freedom. বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতার কথা বলে, বলে মুক্তচিন্তার কথা। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শত চিন্তার মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা চলবে— এটাই কাম্য। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে ভিন্ন কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর নয়। সেখানে মার্কিন পণ্ডিতদের গবেষণাগ্রন্থ এবং গবেষণাপ্রবন্ধ দেদারসে পড়তে হয়েছে। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি সেখানকার শিক্ষকরা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদদের লেখা কোনো গ্রন্থ কিংবা গবেষণাপ্রবন্ধ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতেন না। অথচ আমরা জানি অর্থনীতি শাস্ত্রের উত্থান ও প্রসার ব্রিটেনেই ঘটেছিল। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদরা এই শাস্ত্রে মৌলিক অবদান রেখেছিল। এমনকি ইউরোপের অন্যান্য দেশের অর্থনীতিবিদদের লেখা বইপত্রও কার্যত পড়তে উৎসাহিত করা হতো না বস্টনে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল Economics and Management of Public Enterprise কোর্সটি। এটি পড়াতেন প্রফেসর লিরয় জোনস। তার নির্দেশিত পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল ডাচ্ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ইয়ান টিনবার্গেনের একটি প্রবন্ধ। আমি সেই অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা কেন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদদের লেখা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেন না? জবাবে তিনি কিছুটা কাঁধ বাঁকিয়ে বলেছিলেন, এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিরুচির বিষয়। আমেরিকার অর্থনীতির অধ্যাপকদের আমেরিকান অর্থনীতিবিদপ্রীতি নেহেরু কথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার ধারণার পরিপন্থী। তবে আমার মার্কিন অধ্যাপকরা তাদের লেকচারে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিশাস্ত্রের দর্শনের সঙ্গে অন্য মার্কিন অর্থনীতিবিদদের দর্শনের পার্থক্য সম্পর্কে প্রায়ই উল্লেখ করতেন। শিকাগোর পণ্ডিতরা অবিমিশ্র বাজার অর্থনীতির প্রবল প্রবক্তা। একথা সত্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিংশ শতাব্দীতে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এর ওপর রয়েছে মার্কিনিদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি মজ্জাগত ধারণা। চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি একপেশে হতে পারে, তাহলে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন্তা ও মতবাদের স্বাধীনতা কতটুকু নিশ্চিত হবে তা কিছুটা ধারণা করা যায়। রাজনৈতিকভাবে প্রচণ্ড বিভাজিত একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চিন্তা ও দর্শনের কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস অচিন্তনীয় কিছু নয়। তারপরও বলব নির্দিষ্ট চিন্তার মধ্যেও যদি সৌকর্য ও গভীরতা অর্জনের প্রয়াস থাকে তাহলেও সেটি হবে অভিনন্দনযোগ্য। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এত বছরের মধ্যেও যদি তা সম্পূর্ণ গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতো, তাহলে জাতির জন্য বড় ধরনের অর্জন ঘটত। কবি কাজী নজরুল ইসলাম মোল্লাদের বিবি তালাকের ফতোয়া খোঁজার কসরত নিয়ে বিদ্রূপের হুল ফুটিয়েছেন। ওইসব ফতোয়ার কারণে মুসলিম সমাজ অনেক পিছিয়ে গেছে। একইভাবে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হয়েছে কী হয়নি বলে আমরা যদি তাৎপর্যহীন বিতর্কে লিপ্ত থাকি তাহলে উচ্চতর জ্ঞানের চর্চা কথার কথাই থেকে যাবে। এদেশে রাজনীতির চরিত্র হল দোষারোপের। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাও দোষারোপ চর্চায় পর্যবসিত হয়েছে। দোষারোপ করার প্রয়োজন যাতে না হয় সেজন্য আমাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্নমুখী চিন্তা করতে হবে।

টনি যুড তার The Thinking Twentieth Century বইতে লিখেছেন, তিনি একাডেমিক গাইডেন্স খুঁজতে শুরু করেছিলেন। বলেছিলেন, কেমব্রিজে আপনাকে ঠিক শেখানো হয় না। আপনি বই পড়বেন এবং তার ওপর আলোচনা করবেন। শিক্ষকদের মধ্যে বিশাল বৈচিত্র্য ছিল। যেমন পুরনো ধারার অনুগামী, উদারবাদী ইংলিশ, বাস্তব তথ্যভিত্তিক ঐতিহাসিক, পদ্ধতিগতভাবে সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিক এবং কিছু অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক, যারা দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী বামপন্থী মতবাদের ঐতিহাসিক ছিলেন। দেখা যাচ্ছে ইতিহাস গবেষণায় রয়েছে অনেক ধারা। অথচ আমাদের দেশে একমাত্রিক ইতিহাসের বাইরে যাওয়া যাবে না। এমনকি ইতিহাসের ইতিহাস হয়ে ওঠার আগেই নির্ধারিত হয়ে যায় ইতিহাস। এর ব্যতিক্রম হলে বলা হয় ইতিহাসের বিকৃতি। নানা মত ও দার্শনিক স্কুল শুধু ইতিহাস পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো বটেই। বুঝতে পারি পৃথিবীর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একই ধারায় চলে না। এগুলোর মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য আছে। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ পেলে বোঝা যায় জ্ঞানের স্বাদেও তারতম্য আছে। জীবনের এই পর্যায়ে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমার আকাঙ্ক্ষা হল বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে সব চিন্তা ও মতবাদের অভয়াশ্রম।

১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এত বছরের মধ্যেও যদি তা সম্পূর্ণ গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতো, তাহলে জাতির জন্য বড় ধরনের অর্জন ঘটত। কবি কাজী নজরুল ইসলাম মোল্লাদের বিবি তালাকের ফতোয়া খোঁজার কসরত নিয়ে বিদ্রূপের হুল ফুটিয়েছেন। ওইসব ফতোয়ার কারণে মুসলিম সমাজ অনেক পিছিয়ে গেছে। একইভাবে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হয়েছে কী হয়নি বলে আমরা যদি তাৎপর্যহীন বিতর্কে লিপ্ত থাকি তাহলে উচ্চতর জ্ঞানের চর্চা কথার কথাই থেকে যাবে।

ড. মাহবুব উল্লাহ: *অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ*